ISSN : 3006-449X
INTERNATIONAL JOURNAL OF DIVERSE DISCOURSES

Published by: Centre for Academic Research and Development

An Open Access, Widely Indexed, Peer Reviewed Referred Journal
Vol. 1 No. 3, September, 2024

রহু চণ্ডালের হাড়: ধর্মমুক্ত জীবনের গল্প

Dr. Md. Mizanur Rahman*
Professor, Department of English, Islamic University, Kushtia-7003, Bangladesh.
Corresponding Author: * Email: drmizan_22@yahoo.com

ARTICLEINFO

Keywords: Maximum five keywords here, separated by a comma

Received : 30 July,2024
Revised : 30 August, 2024
Accepted: 7 September, 2024

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

সারসংক্ষেপ:

['রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসে অভিজিৎ সেন তুলে এনেছেন উত্তরবঙ্গের বিলুপ্তপ্রায় যাযাবর বাজিকরদের সংগ্রামী জীবনকে। যে বাজিকর গোষ্ঠীর জীবনালেখ্য তিনি রচনা করেছেন সে জীবনের লক্ষ্য শুধু অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা এবং সমাজে স্থিতি লাভ করা। প্রাচীন এই জাতির জীবনে জৈবিক অস্তিত্বের চেয়েও এক সময় বড় হয়ে দেখা যায় ধর্মীয় পরিচয়। বাজিকরদের ধর্মমুক্ত জীবনে ধর্মের অনুপ্রবেশে কিভাবে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিনাশ ঘটে সাপ্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটে তা অনুসন্ধান করাই এই এই গবেষণা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।]

নিভৃতচারী জীবনবাদী বিপরীত মেরুর স্বল্পপ্রজ ঔপন্যাসিক অভিজিৎ সেন সেই প্রজাতির লেখক "যারা রক্তের উষ্ণতা দিয়ে জীবন রাঙায়, জীবন পুড়িয়ে সত্যের সুষমা আবিষ্কার করে।"[১] তিনি শিল্পসৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ করেছেন গ্রামবাংলার লোকজীবন থেকে, দূর অতীতের ধূসর হয়ে যাওয়া সমাজ ও জীবনকে টেনে তুলে এনে জীবন্ত করেছেন তাঁর লেখনীতে। সমাজ ও রাজনীতি সচেতন লেখক অভিজিৎ সেনের উপন্যাস ও ছোটগল্প যেন সুখ-দুঃখ-সংগ্রাম মেশানো এই সময়ের দলিল। শিল্পরসসমৃদ্ধ শিল্পময় বিবরণে গতিশীল লেখনীতে তিনি সেই সব মানুষের কথা বলেন যারা জীবন ঘষে আগুন জালায়, ক্লান্তিকর অথচ অনিবার্য অতলচক্রে পরিভ্রমণ করে প্রাণটুকু টিকিয়ে রাখার জন্য, স্থিতিশীল জীবনের জন্য। অভিজিতের শৈল্পিক মানস গঠন হয় বরিশালের অকৃত্রিম অনিঃশেষ ঔদার্য ও প্রাকৃতিক রূপৈশ্বর্যে। তৎকালীন বৃহত্তর বরিশাল জেলার ঝালকাটি মহকুমার (বর্তমানে জেলা) কেওড়া গ্রামে জন্ম এবং বেড়ে ওঠার সুত্রে বরিশাল তাঁর কাছে "এক মোহনীয় স্বপ্নাচ্ছন্নতার আকরভূমি।"[২] গ্রামবাংলার এই লোকজীবনের প্রতি আকর্ষণের সুত্রেই অভিজিৎ সেন দেশীয় রীতির অনুসরণে সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে অবস্থান নেন, পাশ্চাত্যের উপন্যাসের ধারা তিনি উপেক্ষা করেছেন সচেতনভাবে কারণ বাংলায় যে মূল্যবান সাহিত্য উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তা বাংলার সমাজ সংস্কৃতির অপরিহার্য অবিচ্ছেদ্য অংশ, তার সঙ্গেই অভিজিতের আত্মিক যোগ সর্বাধিক। পাশ্চাত্যের উপন্যাসের ধারার চেয়ে বাংলার শরৎ, মানিক, তারাশংকর, বনফুলের উপন্যাসের ধারা কোন অংশেই কম নয়। তাই তিনি স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ নিয়ে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গন থেকে কুড়িয়ে নিয়েছেন তাঁর শিল্পের রসদ, উপস্থাপন করেছেন দেশীয় রীতিতে, "ইউরো-কেন্দ্রিকতার পরিবর্তে দেশজ ঐতিহ্যের কাছেই বাংলা তথা ভারতীয় উপন্যাসের বিষয় ও পরিকাঠামোর চাবিকাঠি খুঁজতে চেয়েছেন অভিজিৎ সেন। ... ইউরোপীয় ভাবনা-পরিধির প্রান্তিকতাকে অতিক্রম করে অভিজিৎ সম্ভাবনার সেই দুরতিক্রম্য জনপথগুলিকে উন্মোচিত করতে চেয়েছেন এবং উপন্যাসের কাঠামোয় দেশজ খড়-মাটি-প্রলেপের সার্থক ব্যবহার করে নির্মান করতে চেয়েছেন সম্পূর্ণ নিজস্ব এক ভারতীয় আখ্যান-প্রতিমা।"[৩] প্রবহমান বাংলার আনাচে-কানাচে লুকিয়ে থাকা লোকগাথা, লোককাহিনী, পৌরাণিক কাহিনী, কল্পপৌরাণিক উপাখ্যান তাঁকে ডুবিয়ে রাখত সুখস্বপ্নাবিষ্টতায়, মৃত্তিকার স্পর্শে জেগে ওঠা প্রাণের স্পন্দনে ভরে থাকত জীবন। বাংলার পথে প্রান্তরে বিচরণশীল যাযাবর মানুষের জীবন গাথা তাঁকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছে। সৃষ্টিছাড়ার অভিজ্ঞতার আলোয় আলোকিত অভিজিৎ এইসব ঘরহীন যাযাবর মানুষের জীবনকে রূপ দিয়েছেন তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে।

মধ্যবিত্তের দুঃখ-বেদনার তরল আবেগ জাগানিয়া বিষয়বস্তু নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত্তোর কালে উপন্যাস রচনার যে ধারা বাংলা সাহিত্যে গড়ে ওঠে, তার ধারে কাছে যাননি অভিজিৎ সেন। তিনি ইতিহাস এবং কল্পপুরাণের সারাৎসারকে পুঁজি করে পাঠককে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন ধূসর অতীতের অন্ত্যজ বাজিকর শ্রেণীর গৃহস্থ জীবনের অধিকারী হওয়ার সংগ্রামমুখর সময়ে। লেখকের পক্ষ থেকে সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টির কোন প্রয়াস এই উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায় না কারণ তিনি সমুদ্র মন্থনের মতো সামাজিক বৃত্তের পরিধির বাইরে অবস্থান করা নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবন থেকে উপাদান খুঁজে নিয়েছেন, "বিগত দেড় শতকের ধূম্রজাল-বেষ্টিত গাঢ় অন্ধকার গহ্বর কেটে ছিঁড়ে টেনে বের করেছেন একটি জাতির মৌল সত্তার প্রকৃত প্রবণতা, আন্তর ঝোঁকের গতিপ্রকৃতি। অন্তর্গত রক্তের প্রদাহ উচ্ছ্রিত উষ্ণতা ও ক্ষিপ্রতা, রক্তের দুর্জ্ঞেয় কার্যধারা একটি জাতির সার্বিক প্রবণতার মৌল উপাদান হিসেবে যে ভূমিকা পালন করে তার পরিশুদ্ধ ফটোগ্রাফি চালচিত্র আঁকার কৃতিত্ব অভিজিৎ সেনের।"[৪] উপন্যাসের পটভূমি নির্মানে অভিজিৎ সেন আশ্রয় করেছেন বাজিকরদের বিস্তীর্ণ জীবনকে, সেই জীবনকে তিনি উত্তীর্ণ করেছেন শিল্পে। নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ক্যানভাসে প্রতিফলিত হয়েছে বাজিকরদের পৌরাণিক-ঐতিহাসিক আলো-আঁধারির জীবন যে জীবনকে বারবার উচ্ছেদ হওয়ার যন্ত্রনা আঘাত করেছে, দগ্ধ করেছে। অধুনা সময় অস্থিরতার সময়, সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের যুগ, ক্ষয় ও বিকারের যুগ, "ইউরোকেন্দ্রিক আধুনিকতার অন্তর্ঘাত যখন জীবনের মূল্যবোধকে পঙ্গু করার জন্য সদাতৎপর ... শিল্পভাবনা যখন দেশীয় ও লোকায়ত দর্শন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে- অভিজিৎ সেনের উপন্যাস এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিস্রোতের বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছে বাংলা সাহিত্যে।"[৫]

অভিজিৎ সেন নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনের রূপকার। তিনি নিম্নবর্গের জীবনকে তার উপন্যাসের ভরকেন্দ্রে স্থাপন করেছেন। অভিজিৎ সেনের বঙ্কিম পুরস্কার জয়ী উপন্যাস 'রহু চণ্ডালের হাড়' (১৯৮৫) যাযাবর সম্প্রদায়ের জীবনের ভাঙ্গাগড়ার এক জীবন্ত আলেখ্য, "সমগ্র উপন্যাসে অভিজিৎ সেন বিপন্ন বাজিকর জীবনের যে আখ্যান তুলে ধরেছেন জীবনযাপনে, অনিবার্য পরিবর্তনে, প্রতিবাদ-প্রতিরোধে, ধ্বংস-বিপন্নতায়, সর্বোপরি ভাঙনের শেষে সম্ভাব্য নবনির্মাণের প্রগাঢ় প্রত্যয়ের মাধ্যমে উপন্যাসটি যথার্থভাবে উত্তর-ঔপনিবেশিক চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসের শিল্পিত আখ্যানে পরিণত হয়েছে।"[৬] উপন্যাসে বর্ণিত

এ কাহিনি বাজিকরদের আত্মপরিচয় সন্ধানের কাহিনি। সমগ্র আখ্যানের ত্রিস্তরীয় বিভাজনে রয়েছে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক উপাদানের সম্মিলন। প্রথম কাহিনি রহু চণ্ডালকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, দ্বিতীয় কাহিনি আবর্তিত হয়েছে যাযাবর বাজিকরদের ভূমিতে শেকড় গেড়ে গৃহস্থ হওয়ার কাহিনি এবং তৃতীয় কাহিনি গড়ে উঠেছে সমাজের সঙ্গে বাজিকরদের সম্পর্কের বিষয়কে কেন্দ্র করে।

লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসটি। যাযাবর বাজিকর গোষ্ঠীর দেড়শ বছরের "ঘোরাফেরাকে কেন্দ্র করে আমি একটা বিস্তৃত অঞ্চলের এই সময়ের ইতিহাস, সমাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম ইত্যাদি বহু বিষয়কে টুকরো টুকরো করে তুলে এনেছি।"[৭] অভিজিৎ সেনের ভাষ্য থেকে জানা যায়, ১৯৭৩-১৯৭৪ সালে যখন এক বছর তিন চার মাস তিনি চাকুরী সূত্রে তৎকালীন পশ্চিম দিনাজপুরে (বর্তমানে দক্ষিন দিনাজপুর) অবস্থান করেন সেই সময় বালুরঘাট মহকুমার তপন থানার কয়েকটি গ্রামে বাজিকরদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় এবং মাঝখানের কয়েক বছর বাদ দিয়ে ১৯৭৬-৭৭ সাল থেকে ফের বাজিকরদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ হয়। বেশ কয়েক বছর তিনি খুব কাছ থেকে এবং দূর থেকে বাজিকরদের দেখেছিলেন; তাদের সমাজ, ভাষা, ধরন, জীবনাচরণ, জীবনবোধ, আচার-ব্যবহার, সংস্কার ও বিশ্বাস সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এই অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে তিনি ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে 'রহু চণ্ডালের হাড়' রচনার কাজ শুরু করেন। লেখকের দেখা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় তিনি উপলব্ধি করেন যে, উঁচুনিচু রুক্ষ কাঁকরময় গেরুয়া রঙের পলিমাটিতে বাস করা আদিবাসী এবং তপসিলি সম্প্রদায়ের দরিদ্রতম মানুষের মধ্যে বাজিকররা অন্যতম। এই বাজিকরদের একটি দলের ধর্মান্তরিত হওয়া সম্পর্কে যে তথ্যটুকু তিনি তাঁর উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন তাও তিনি পেয়েছিলেন তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে :

> বাজিকরদের একটি দল সামান্য কিছু পাওয়ার আশায় যখন মুসলমান হওয়ার সংকল্প করে, সে পর্যায়টা আমি ভালোভাবে লক্ষ্য করেছিলাম। বাজিকরদের নিজস্ব কোন ধর্ম ছিল না। তাদের বৃদ্ধদের কাছ থেকে আমি শুনেছিলাম, পথচলতি অবস্থায় গৃহস্থ মানুষের সমাজের কোনো কোনো লৌকিক ধর্ম বিশ্বাসের দেব-দেবীকে তারা কখনো কখনো আশ্রয় করে। 'বিগামাই', 'ওলামাই' এ রকম দু-একটি মাতৃশক্তির খুবই অবস্থা ধীরধার কথা তারা আমাকে বলেছিল। 'ওলামাই' বোঝা যায় কিন্তু 'বিগামাই' কে, কী তার কাজ, আমি বুঝতে পারিনি। তাদের কোনো দেবস্থান আমি দেখিনি, কোনো পুজো অর্চনার স্থুলতর পদ্ধতিও দেখিনি আমি। দুই প্রবল ধর্মবিশ্বাসী সমাজের মধ্যে সততই নিস্পিত বাজিকরেরা কেমন যেন অপ্রস্তুত তাদের অস্তিত্ব নিয়ে, এমনই তাদের মনে হয়েছিলো আমার। বস্তুত, আমার অভিজ্ঞতায় এরকম মানুষ আর ছিলো না। তবুও তারা বুঝেছিলো যে, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে তাদের 'থিতু' হতে হবে। জোত জমি বাড়ি-ঘর নিয়ে যে জীবনযাত্রা চালায়, সে হলো 'গেরস্ত' এবং তার স্ত্রী 'গেরস্তানি'। তাদের মর্যাদা বাজিকরের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সে শুধু স্থিত হতে চায়। বাজিকর চোর, বাজিকর ভবঘুরে, বাজিকর ভিখারি, সে আর এসব শুনতে চায় না। সে শুধু স্থিতিশীল মানুষ হতে চায়। ''আলির উপর কালী, না কালীর উপর আলি' এ বৃত্তান্ত সে কারো কাছে জানতে চায় না। কালী বা আলি, প্রধান এই দুই বৃত্তের যে কোনো একটির অন্তর্ভুক্ত হতে চায় সে। কোনোটিতেই তার অবশ্য দুর্বলতা নেই। অবশেষে মুসলমানদের তরফে কেউ কেউ তাদের শুধু স্থিতিশীল হওয়ারই নয়, জাতপাতের আশ্বাসও দেয়। আমি সেই পর্যায়টা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলাম, বাজিকরদের নিয়ে উপন্যাস লেখার ভ্রূণ সেই ঘটনা থেকেই আমার চিন্তায় রূপ পেতে শুরু করে। ধর্মান্তর ব্যাপারটা বাজিকরদের বেলায় খাটে না। তার শুধু ধর্মগ্রহণ।"[৮]

উত্তরবঙ্গের এক যাযাবর গোষ্ঠীর জীবন সংগ্রামের কাহিনিকে অবলম্বন করে অভিজিৎ সেন রচনা করেন উপন্যাসটি যেখানে তিনি দেখানোর প্রয়াস পেয়েছেন যে, মানবজাতির বিভিন্ন গোষ্ঠী ও গোত্রে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব সর্বদা ক্রিয়াশীল। অজস্র নৃতাত্ত্বিক উপাদানসমৃদ্ধ এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে "এক যাযাবর জনগোষ্ঠীর কৃষি সভ্যতায় উত্তরণের ইতিহাস।"[৯]

উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে বাজিকর গোষ্ঠীর প্রাচীন দলনেতা রহুর পৌরাণিক আখ্যানকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসটিতে বিধৃত হয়েছে বাজিকরদের ঠাই বদলের ইতিহাস। অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলেন : "স্থবিরতার বিপ্রতীপে উপস্থাপিত গতি এই উপন্যাসের অতন্দ্র সন্ধিকে তাৎপর্যপূর্ণ করেনি শুধু, সমাপ্তিবিহীন উপসংহারের মধ্য দিয়ে যাযাবর সম্প্রদায়ের গৃহস্থ হওয়ার সংকেতও দিয়েছে। পেছনে পড়ে থাকে অতীতের স্মৃতি ও বিষাদ; জীবনের অমোঘ নিয়মে এগিয়ে যেতে হয় শুধু সামনে- এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন অভিজিৎ। অজস্র মৃত্যুও বাস্তবের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে যায়, তবুও জীবনের দাবী মেনে নিয়ে যাযাবরের উত্তরসূরি বসত গড়ে।"[১০]

অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ বাজিকরদের কয়েক পুরুষ ধরে দীর্ঘ পথ চলার কাহিনী শুরু হয়েছে তাদের প্রবাদ পুরুষ রহু থেকে, তারপর কাহিনী এগিয়েছে পরবর্তী প্রজন্মের পীতেম, পীতেম থেকে বালি, পরতাপ, জামির, রূপা, ইয়াসিন হয়ে শারিবা পর্যন্ত; এই কয়েক প্রজন্মের পথ চলার কাহিনী সন্নিবেশিত হয়েছে অজস্র টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে। এই উপন্যাস তুলে এনেছে প্রায় লুপ্ত বাজিকর নামের এক যাযাবর সম্প্রদায়ের ভাসমান জীবনের গল্প, পৃথিবীর বুকে একদল হতভাগ্য মানুষের জায়গা করে নেবার সংগ্রাম। হাজার বছর ধরে চলে আসা দেবতার অভিশাপে অভিশপ্ত এবং অবহেলিত যাযাবর জাতি। প্রাচীনকালের সেই পাপের বোঝা আজও কাঁধে বয়ে চলেছে তারা। এ পাপের যেন শেষ নেই। যাযাবর বাজিকররা চেষ্টা করে থিতু হওয়ার, পেশা বদলে গেরস্থ হতে চায়, পতিত জঙ্গলাকীর্ণ জমি পরিষ্কার করে কৃষিকাজে মন দেয়, বসতবাড়ি বানায়, একটু থিতু হওয়ার মতো হলে তখনই পথের মানুষ পথের হয়ে যায় সেই প্রাচীন পাপের ফলে। এ যেন বাজিকরদের যুগযুগান্তরব্যাপী, জন্মজন্মান্তরের অস্তিত্বহীন জীবনের বোঝা বয়ে বেড়ানো ভবঘুরে যাত্রা।

ঘরহীন বাজিকর, পথেই তার জীবন, পথেই জন্ম, পথেই মৃত্যু। এক অন্তহীন অনিশ্চিত পথ তাদেরকে নিয়ে যায় স্থানান্তরে, এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে, থিতু হওয়ার তীব্র বাসনাতাড়িত বাজিকর ধর্মহীন জাতহীন হওয়ার কারণে থিতু হতে পারে না কোথাও। শত শত বছর সমাজ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কেটে যায় যাযাবর বাজিকরদের। এক সময় পথের ক্লান্তি তাদের এই উপলব্ধিতে উপনীত করে যে, "রাস্তাৎ আর সুখ নাই, স্বস্তি নাই। পথে বিপদ আগেও আছিল, বাদে তা হোল সীমাছাড়া। সামাজের মানুষে নানাকারণে বাজিকর বাদিয়াকে ছিড়া খায়।"[১১] তাই তো তিন-চার পুরুষ ধরে তারা চেষ্টা করে চলেছে থিতু হওয়ার। কিন্তু থিতু তারা হতে পারে না কারণ তাদের কোন ধর্ম নেই, রাষ্ট্র নেই, রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নেই। সমাজের কোন ধর্ম সম্প্রদায়ই তাদেরকে গ্রহণ করে না। তবুও আশা ছাড়ে না বাজিকর। দুনিয়ার রাস্তার যেমন শেষ আছে, তেমনি যাযাবর বাজিকরদের রাস্তার জীবনেরও একদিন শেষ হবে।

বাজিকরদের আদি নিবাস ছিলো গোরখপুরের আরও পশ্চিমে এক বালির দেশে। ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়েছে সে দেশ, ধ্বংস হয়েছেবাজিকরদের খেলা দেখানোর পশু, তাবু সবকিছু। লুবিনির বর্ণনায় উঠে আসে সে সব ধ্বংসের কথা, স্মৃতির পাতায় ঝাপ্সা হয়ে আসে অতীতের সেই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প। সে এক অপরিচিত দেশ। সেই অপরিচিত দেশে ঘর্ঘরা নামে এক পবিত্র নদী বয়ে যায়। শনিবারের এক ভূমিকম্পে সব ধুলিস্যাৎ হয়েছিল। ঘর্ঘরার বিশাল এক তীরভূমি ভূ-ত্বকে বসে গিয়ে নদীগর্ভের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। আর তাতে মিশে গিয়েছিল গোরখপুরের বাজিকরদের জীর্ণ বাড়ি-ঘর। সেই শনিবারের কালো অন্ধকার রাতে যে ধ্বংসলীলা ঘটে যায় তাতে বাজিকরদের আর সেখানে টিকে থাকা সম্ভব হয়নি, তারা ঠাই বদল করে ঘর্ঘরার আরো উত্তরে সরে গিয়ে নতুন বসতি তৈরি করে তারা।

বাজিকরদের নতুন ঠিকানা মালদহের মহানন্দা নদীর তীরে। অস্থায়ী ঠিকানায় নতুন করে শুরু হয় তাদের গৃহস্থালি। গঙ্গার ওপারে যে অস্থিরতা, যে উপদ্রব তার আভাস নেই এখানে। জীবন এখানে অনেকটাই শান্ত ও নিরাপদ। তবুও বাজিকরদের জীবনকে ঘিরে থাকে মূলোৎপাটিত হওয়ার অস্বস্তি, সর্বদা 'চোর' গালি শ্রবণের অস্বস্তি, অচ্ছ্যুত ও ব্রাত্য হয়ে থাকার অস্বস্তি, অনিশ্চিত জীবনের অস্বস্তি। এই অস্বস্তির মধ্যে তাদের ছাড়তে হয় রাজমহল, ফলে "ভগ্ন জীর্ণ সহায়হীন মানুষগুলো এখন আরো ধূর্ত ও ঠগ হয়। ঢোলকে ডুগডুগ শব্দ শোনা যায় ঠিকই। কিন্তু তার সঙ্গে সমান তালে থাকে চুরি, বেশ্যাবৃত্তি, হাত দেখা ও ভবিষ্যৎবাণী। কেননা রাজমহল তাদের সবই কেড়ে রেখে দিয়েছে। দলের কাছে এখন পশু বলতে কিছু নেই, সঞ্চিত অর্থও অনেক আগেই নিঃশেষ।"[১২] রাজমহল থেকে নিঃস্ব হয়ে যাত্রা করে বাজিকরের দল। গন্তব্য পূবের দেশ। কোথায় তা জানে না তারা, শুধু এই জানে তাদেরকে যেতে হবে। নিঃস্ব মানুষগুলোর জীবনে নেই কোন নিশ্চয়তা; অনিশ্চয়তায় ভরা জীবনের বাঁকে বাঁকে সঞ্চিত আছে শোষণের ইতিহাস, বঞ্চনার ইতিহাস, মানুষ ঠকানোর ইতিহাস। ইতিহাসের পাতায় তারা

শুধুই যাযাবর, শুধুই ধুড়িবাজ, ঠগী, মানুষ ঠকানোই তাদের পেশা। কিন্তু তাদের জীবনের যে যন্ত্রনা, অনিশ্চয়তা, ক্লান্তি তার ইতিহাস কেউ জানে না। পূবের দেশে পশ্চিমের ধ্বংস না থাকলেও কিছুতেই তারা ভুলতে পারে না সেই সব ধ্বংসাত্মক স্মৃতি, "পশ্চিমের ভীতি এখনো তাদের মারাত্মক। কারণ পশ্চিমে একসময় ধ্বংস এসেছিল, জলস্তম্ভ হয়েছিল যা রহুকে ভাসিয়ে নিয়েছিল। পশ্চিমে গোরখপুরে ভূমিকম্পে বিশাল ভূ-খণ্ড মাটিতে বসে গিয়েছিল।"[১৩]

নতুন ঠিকানা থেকে উচ্ছেদ হওয়াই যেন বাজিকরদের নিয়তি। প্রতি বছর বর্ষা ঋতুতে মহানন্দার জল উপচে দু'কুল ভাসিয়ে নিয়ে যায়, বাজিকরেরা দলবল নিয়ে পিছিয়ে গিয়ে আবার নতুন জায়গায় তাবু ফেলে। এভাবে প্রতি বছর পরের জমিতে অস্থায়ী বাসা বাঁধে তারা। ক্রমে জীর্ণ তাঁবুগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তখন তাদের ঠায় হয় "খোলা মাঠে অথবা খড় এবং তালপাতার ছাউনির নিচে।"[১৪] বাজিকরদের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, সারা দুনিয়ায় দাঁড়ানোর মত কোন জায়গা নেই তাদের। পীতেম বাজিকর চেয়েছে স্থায়ী আবাস। জবুথবু শরীর, ভেঙ্গে পড়া মন, স্থানান্তরে ঘুরে ঘুরে বড় ক্লান্ত সে। সালমার মধ্যস্ততায় স্থানীয় জমিদার বদিউল ইসলামের কাছ থেকে খাজনার বিনিময়ে মালদহ শহর থেকে পচিশ-ত্রিশ মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে মহানন্দা ও টাঙ্গন নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে আগাছার জঙ্গলে পূর্ণ বসতিহীন জমি পায় বাজিকররা। এখানে পৃথিবী এখনো আদিম। বছরের প্রায় পুরো সময়ই এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন থাকে। উত্তরের বালিমিশ্রিত পলি জমে জমে এখানে সৃষ্টি হয় উঁচু ঢিবির। এই নতুন ঠিকানায় বাজিকরদের জীবনধারা প্রবাহিত হবে এক অনাগত ভবিষ্যতের দিকে, তার গতিপ্রকৃতি পাল্টে যাবে, যাযাবর জীবন ছেড়ে থিতু হবে বাজিকরেরা। কিন্তু নতুন জীবনের সঙ্গে বাজিকরদের সম্পর্কই বা কতটুকু। নতুন জলাভূমির ধূসরতা বাজিকরদের ভাবিয়ে তোলে, এমন জলাভুমিতে কিভাবে গড়ে তুলবে নতুন আবাস। কিন্তু বাজিকরদের থাকতে হবে এখানে কারণ "মুক্ত পৃথিবীর এবং অজ্ঞাত রাস্তায় ভয়াবহতা কি পরিমাণ বেড়েছে, সেকথা যাযাবরের থেকে ভালো কে বোঝে?"[১৫] আশ্বিনের শেষে পীতেম তার বাজিকরের দল নিয়ে যায় জমিদারের পত্তনি দেওয়া নতুন জমি দেখতে, সামনে তাকিয়ে তারা দেখতে পায় দিগন্তবিস্তৃত আদিম ভূখণ্ড। নতুন ঠিকানা তাদের ভেতরে জন্ম দেয় হতাশার, ফাঁপা শূন্যতার। তবুও আশা ছাড়ে না তারা। মালদা থেকে বাস উঠিয়ে পীতেম তার লোকজন নিয়ে নমনকুড়িতে শুরু করে নতুন পথ চলা। খালাস করা জমিতে তারা ফসল ফলাতে শুরু করে। নমনকুড়িতে ক্রমাগত ভালো ফসল হচ্ছে। উদ্যমী বাজিকর এবং সাঁওতাল-ওঁরাওরাও নতুন নতুন জমি হাসিল করে চাষাবাদ শুরু করে। নমনকুড়ি, জামিলাবাদ এবং হিঙ্গলের যাবতীয় ডুবো জমিতে সোনা ফলতে লাগল। নমনকুড়িতে পর পর দুই বছর বন্যা না হওয়ায় বাজিকররা জমিতে আমন চাষ ও পশু পালন করে নতুন জীবনের সূত্রপাত করে। কিন্তু মুশকিল হলো, যে প্রত্যাশা নিয়ে পীতেম এবং তার লোকজন নমনকুড়িতে বসতি গাড়ে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। বাজিকরদের সবাই গৃহস্থ হতে পারে না। জামির ও পরতাপকে দেখে আরও পাঁচ দশজন বাজিকর জমিতে মেহনত দিতে শুরু করে। মুশকিল হলো বাজিকরদের ধৈর্য কম; প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা অন্য কোন বাঁধা এলেই বাজিকররা হতাশ হয়ে যায়, তারা বুঝতে চেষ্টা করে না, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মেনে নিয়েই কৃষিকাজ করতে হয়; বন্যা, ঝড়, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি এগুলো থাকবেই, এগুলো চাষেরই নিয়ম। কিন্তু এসব কথা জাত বাজিকরকে বুঝানো যায় না, তাদের ধৈর্য খুব ভঙ্গুর, অপেক্ষা করা বাজিকরের রক্তে নেই। ফলে জামির, পরতাপ এবং আর কয়েক ঘর বাজিকর চাষের কাজে আত্মনিয়োগ করে আর বাকিরা যে যার মতো পুরনো পেশা আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করে।

বাজিকরদের নমনকুড়ির জীবন স্থায়ী হয়নি; যেসব বাজিকর তাদের প্রাচীন পেশাকে আকড়ে ধরে থাকতে চেয়েছে, একটুতেই তারা গৃহস্থ জীবন ছেড়ে পুরনো পেশায় ফিরে যায়। পরতাপ, জামির এবং তাদের মতো আরও দু-চারজন যারা "জমির সঙ্গে নিজেদের আত্মীয়তা তৈরি করতে পেরেছিল, দূরে জলের মধ্যে তাকিয়ে নিজেদের জমিগুলোর দিক নির্ণয় করার প্রয়াস পায় বৃথাই।"[১৬] বাজিকরদের প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় নমনকুড়ির জলাভূমি উর্বর হয়েছে, সোনালী ফসলে প্রতি বছর ভরে ওঠে বাজিকরদের আঙ্গিনা। পাকা ফসলের সান্নিধ্য বাজিকরদের সঞ্জীবনী দান করে, এতকাল ধরে মনের অভ্যন্তরে যে আকাঙ্ক্ষা লালন করে এসেছে, নমনকুড়িতে তাদের সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। ফসলের ঘ্রান বাজিকরদের এনে দেয় এক অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা। ধান ও তা থেকে রূপান্তরিত চাউল তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে বিহ্বল ভাব। বাজিকররা যখন মাঠ থেকে ফসল কেটে পাগড়ি বাঁধা মাথায় করে বাড়িতে আনে তখন তাদেরকে "পুরোপুরি চাষি গেরস্থের মতো দেখায়, জামিরের তরুণ পেশীগুলো সূর্যের আলোয় যৌবনের ইঙ্গিত দেয় ..."[১৭] এভাবে ধীরে ধীরে নতুন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় বাজিকররা।

বাজিকরদের নমনকুড়ির দিন শেষ হয়ে আসছিল; পনের বছর ধরে গৃহস্থ জীবনে ধাতস্ত হয়ে যাওয়া বাজিকরদের জন্য অপেক্ষা করে আর এক মহা বিপর্যয়। এক বছর বর্ষার সময় নমনকুড়ির নিচু জায়গা ডুবে যায়, পরের বছর ডুবে যায় নতুন আবাদি

জমি, আর তার পরের বছর প্রবল জলস্রোতে নমনকুড়ি পুরোপুরি ডুবে যায়, নমনকুড়ি আবার ফিরে যায় আদিমতায়, "নমনকুড়ির মানুষ ও জানোয়ার অনাদরে অবহেলায় দুরন্ত বর্ষার সঙ্গে লড়াই করে, মরে।"[১৮] বিগত পনের বিশ বছরের মধ্যে এমন অভিজ্ঞতা কারোরই হয়নি। বাজিকররা নমনকুড়িতে আসার পর কখনও বন্যা হয়নি। বৃষ্টি শেষ হয়ে আকাশে শরতের মেঘের আনাগোনা শুরু হয় কিন্তু তখনও জল নামে না, নমনকুড়ির জল দিগন্ত পর্যন্ত থৈ থৈ করে। সাঁওতাল এবং ওঁরাওরা আশায় থাকে জল নেমে গেলে ডুবে যাওয়া ভিটেগুলো সন্ধান করে বের করে মাটি তুলে উঁচু করে আবার সেখানে ঘর বাঁধবে কিন্তু বাজিকররা এমন সাহসী চিন্তা করতে পারে না। তাই বাজিকররা সিদ্ধান্ত নেয় নমনকুড়ি থেকে বাস উঠিয়ে আরও পূবে নতুন জায়গায় ঠাই গড়বে যেখানে তারা নমনকুড়ির মতো অজস্র ফসল ফলাতে পারবে কিন্তু ডুবে যাবে না। আসলে বাজিকরের মনোবলে ভাঙ্গন ধরেছে, নমনকুড়ির থিতু জীবন তাদের রক্তের চাঞ্চল্য অনেকটাই নিঃশেষ করে দিয়েছে, এখন "তারা অল্পেতেই পড়ছে ক্লান্ত হয়ে, তাদের কোমর বেঁকে যাচ্ছে, হাত ঝুলে পড়ছে সামনের দিকে। সেই রাজমহলের আমল থেকে একটানা পথ চলার অভ্যাস চলে গেছে।"[১৯]

নমনকুড়ির গৃহস্থ জীবনের সমাপ্তি ঘটে আবার শুরু হয় নতুন ঠাই খুঁজার সংগ্রাম। নমনকুড়ি থেকে বাস উঠিয়ে আবার পূবের দিকে নতুন জায়গা খুঁজে নেওয়ার জন্য যাত্রা করে বাজিকররা। তারা এমন একটি জায়গা খুঁজছে যেখানে তারা পুরোদস্তুর গৃহস্থ জীবন পাবে, যেখানে নমনকুড়ির মতো অজস্র ফসল ফলাতে পারবে কিন্তু জলে ডুবে যাবে না। পেছনে পড়ে থাকে পনের বছরের গৃহস্থ জীবনের স্মৃতি, সুখস্বপ্নের স্মৃতির মতো নমনকুড়ি রয়ে যায় এক বিস্ময় হয়ে। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ফিরে শেষ পর্যন্ত জামির রাজশাহীতে এসে পৌঁছায়; লুবিনি এই পূবের দেশের কথাই বলে শারিবাকে, "যে পূবের দেশের কথা দনু পীতেমকে বলেছে, পীতেম বলেছে পরতাপকে, জামির আর লুবিনিকে, জামির বলেছে রূপাকে, আর এখন এই সমুদয় পূবের দেশের বৃত্তান্ত লুবিনি শোনায় শারিবাকে। কিন্তু কোথায় যে সেই স্থির দেশটি, যেখানে আছে বাজিকরের স্থিতিস্থায়িত্ব, সে কথা কেউ জানে না। প্রতিবারই মনে হয়েছে এই বুঝি সেই দেশ। প্রতিবারই কোনো না কোনো আঘাত, সে আঘাত মানুষের সৃষ্ট হোক কিংবা প্রকৃতির সৃষ্ট হোক, বাজিকরকে দিশাহারা করেছে।"[২০]

বাজিকর শেকড় গাড়ে কিন্তু সে শেকড় মাটির গভীরে প্রোথিত হয় না, ঘরের কাছে যায় কিন্তু ঘরের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না, গৃহস্থ হতে চায় কিন্তু গৃহ পায় না, জোত-জমির মালিক হতে চায় কিন্তু হয়ে যায় দাস, গৃহস্থ জীবনকে উপভোগ করতে চায় কিন্তু সে জীবনকে উগরে দিতে হয়, সমাজভুক্ত মানুষ হতে চায় কিন্তু ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়তে হয় সামাজিক বৃত্তের বাইরে। তারা পরিশ্রম করে দিগন্ত বিস্তৃত জঙ্গলাকীর্ণ আদিম পতিত ভূমি হাসিল করে চাষযোগ্য করে তোলে আর চালাক লোক সেই জমির দখল নেয়। কলমা পড়ে মুসলমান হয়েও সমাজ বহির্ভূত হয়ে থাকতে হয় বাজিকরকে, "সংখ্যাগরিষ্ঠ বাজিকরের গা থেকে 'বেজাত' তকমা যায় না। তারা হয়ে ওঠে বেজাত মুসলমান। মেয়েগুলোর আগের মতোই বিয়ে হয় না। যা ছিলো ঠিক তাই থাকে। ... যারা হিন্দু হয়েছিলো তারা 'বেজাত' হিন্দু হয়েই থাকে। শুধু নিজেদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ভাগাভাগি হয়ে গিয়ে একতায় চিড় ধরে, উভয় পক্ষই সংখ্যায় কমে গিয়ে আরো দুর্বল হয়ে যায়।"[২১] হানিফ সত্যটা অনুধাবন করতে পারে; তাই সে বাজিকরদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়াকে মানতে পারেনি। ধর্মের অধীনে থাকলেই যে বাজিকরদের সামাজিক নিরাপত্তা ও স্বীকৃতি আসবে- এ কথা বিশ্বাস করে না হানিফ: "তবে আমার বিচার শোন, হিন্দু মুসলমান বেবাক জাত যদি বাজিকরের মতন, মনে কর, বেজাত হয়া যায়, তবে সিটাই ভালো হতো। ...আমি তোমাদের মোছলমান হবার কথাডা ভাবতেছি। এতে কিবা লাভ হবে? কার লাভ হবে? হিঁদুরই বা কী লাভ? মোছলমানেরই বা কী লাভ? আর বাজিকরেরই বা কী লাভ? ... মোছলমান করলে তোমরা থিতু হবার পারবা? ধরম থাকলিই তুমরা থিতু হবার পারবা? ... বাঁচার রাস্তা ইটাও লয় শারিবা।"[২২] হানিফের কথা যে সত্য তার প্রমাণ পাওয়া যায় ইয়াসিনের বয়ানে : "... যেমন ছিলাম তেমনই আছি। তোর বাপই ঠিক বলিছিল, হামরা পাখমারা আর বাদিয়া মোছলমানের মতোই বেজাত মোছলমান হোই গেলাম। ... বেটিগুলার বিহা হয় না। মোছলমান হয়া হামরাদের ঘর তো ফের কমি গেল।"[২৩] ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বাজিকররা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, হাদিস মানে, মুসলমানের কিরাকালাম মানে কিন্তু তারা জাতে উঠতে পারে না, অচ্ছ্যুতই রয়ে যায়।

সমাজের সর্বত্র বৈনাশিক শক্তির রোষে পুড়ে খাক হওয়া বাজিকরদের শেষ পর্যন্ত ঘর জুটলেও সামাজিক মর্যাদা জোটেনি, ব্রাত্য হয়ে সমাজের এক কোণায় পড়ে থাকে অবহেলায় বঞ্চনায়। স্থায়ী বসতি স্থাপনের তীব্র আকর্ষণের সাথে চলতে থাকে বাজিকরদের "উষ্ণ রক্তধারার নিয়ত সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্ব। ... কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনে স্থায়ী-প্রোথনের জন্য যে মৃত্তিকাপ্রণাম ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে সবিশেষ জ্ঞান থাকা অপরিহার্য তথা বাধ্যতামূলক তা বাজিকর সম্প্রদায়ের ভেতরে অনুপস্থিত। ... পীতেমই বুঝতে

পেরেছিল এ একটি বিদ্যা যা বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জন করত হয়। ... জীবনের শেষ স্তরে পৌঁছে তার বিশ্বাস জন্মে যে পথের সুদীর্ঘ জটিল অভিশাপ থেকে বোধ হয় তার সম্প্রদায়ের মুক্তির সূচনার ইঙ্গিত পাওয়া গেলো।"[২৪] পীতেম বাজিকরের এই বিশ্বাস এক অন্তঃসারশূন্য ফাঁকা প্রত্যাশা বৈ কিছু নয় কারণ তার পরবর্তী আরও কয়েক প্রজন্ম পরে মোহরে বাজিকররা থিতু হলেও তারা মুক্তির দিশা পায় না, উল্টো নব্য স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রে তারা দাসে পরিণত হয়। মৃত্তিকামগ্ন ও থিতু গৃহস্থ হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হলেও বাজিকরদের রক্তের গহীনে যাযাবর জীবনের দুর্নিবার নেশা তিরোহিত হয়ে তাদেরকে এক নিশ্চল জাতিগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করে, আজন্ম বেদুইনবৃত্তি ছেড়ে কৃষিকাজে স্থিত হওয়ার ফলে বাজিকরদের জীবনশৈলীতে ভাঙ্গন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

> সময় ও সমাজের কাছে পরিত্যক্ত উপরিস্তরের ফেনপুঞ্জ। মাটির সঙ্গে এদের কোন সংযোগ নেই। মাটিতে এদের আস্থা নেই। বরং বড় ভয়; মাটির অন্তরের শ্বাশত উষ্ণতা এদের বশ্য করে না, অভ্যন্তরীন মাটির দহন ওদের দগ্ধ করে না। মাটির গাঢ় আবেগ ওদের সৃষ্টিশীল করে না, খরা-প্লাবন-দুর্যোগে এরা মর্মাহত হয় না।... বাজিকরের রক্তের গহীনে রয়েছে এক দুর্নিবার ছুটে চলার নেশা। শত শতাব্দীর প্রস্রবিত জীবনধারায় এক অলঙ্ঘ্য গতি চলিষ্ণুতা ওদের রক্তকণিকায় সুক্ষ উপাদানরূপে সংযুক্ত হয়ে পড়েছে।... গৃহস্থ জীবনের নিরাপদ, নির্ঝঞ্ঝাট, নিরুপদ্রব, প্রশান্তিময় অথচ স্থবির জীবনের প্রতি বাজিকরের তীব্র আকর্ষণ আছে, কখনো কখনো নিরুদ্দিষ্ট অনিশ্চিত কষ্টমগ্ন বাজিকরি-জীবন ওদের থিতু-কাঙ্ক্ষা জাগায়, কখনো কখনো স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে স্থায়ী আবাসনের জন্য মাটির সঙ্গে মিত্রতা গড়তে যায় বটে, কিন্তু বহিঃলোকীয় সামাজিক বা প্রাকৃতিক নূন্যতম বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলেই ওদের অভ্যন্তরীণ উত্তপ্ত সর্বদা রক্তে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সামান্য সংঘাত সংঘর্ষ বা বিপর্যয়কে আকণ্ঠ মৃত্তিকাপ্রেমিকরা সর্বংসহার মতো আত্মস্থ করে, স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে, কিন্তু বাজিকরের কাছে তাই অন্যত্র ছুটে চলার যোগ্যতম হয়ে যায়।"[২৫]

'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসে অভিজিৎ সেন রহুকে উপস্থাপন করেছেন বাজিকরদের আদিম পূর্বপুরুষ হিসেবে। সুদূর অতীতে রহু তার স্বজাতির জন্য সুন্দর জীবন দিয়েছিলো। কিন্তু সে জীবন স্থায়ী হয়নি। সে তার মানুষ নিয়ে এমন এক ভূখণ্ডে থাকত যেখানে ছিলো এমন এক নদী যে নদীতে বাজিকরদের পিতৃপুরুষ তৃষ্ণা মেটাত, তারা বাস করত এমন এক দেশে যে দেশ কেউ দেখেনি, যেখানে উৎপাদিত হতো অজস্র সম্পদ, তারা যাপন করত অতুলনীয় এক সুন্দর জীবন, "রহু তার মানুষ নিয়ে সেই ভূখণ্ডে থাকত যেখানে জীবন ছিল নদীর মতো, নদীতে ছিল অফুরন্ত স্রোত, বনে অসংখ্য শিকারের পশু এবং মাঠে অজস্র শস্য।"[২৬] রহু আজ লোকান্তরিত কিন্তু সে সব বাজিকরকে দেখে, রহু দেখে কবে বাজিকরের পথ চলা শেষ হয়। সে চেয়েছিলো বাজিকর স্থিতি পাক, সে তার হাড় দিয়েছিল বাজিকরকে যেন সে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে।

অস্তিত্বের সংগ্রাম আর নানা প্রতিকূলতার মাঝেও বাজিকররা রহুকে বিস্মৃত হয়নি, রহু চণ্ডাল আছে তাদের অস্তিত্বের মূলে। বাজিকরদের বিশ্বাস মতে, এই রহু তাদের ত্রাণকর্তা, সে সবসময় বাজিকরদের সঙ্গে থাকে, তাদেরকে রক্ষা করে, তাদের মঙ্গল চায়; সে চায় বাজিকর সুখে থাকুক, থিতু হোক। নতুন ভূখণ্ডে তাদেরকে স্থিতি না করিয়ে তার মুক্তি নেই। এই রহু বাজিকর গোষ্ঠীর আদিম পূর্বপুরুষ। তাকে আশ্রয় করেই বাজিকরদের আশা-ভরসা আবর্তিত হয়। তবে সে কোন দেবতা কিংবা স্রষ্টা নয় : "রহু ঈশ্বরের মতো সর্বশক্তিমান নয়। সে এক প্রাচীন দলপতি। সে এক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর নীতি নির্ধারণ করত তার জীবদ্দশায়। কিন্তু লুবিনি কিংবা কোনো বাজিকর তাকে ভগবান, আল্লা ইত্যাদির সমগোত্রীয় ভাবতে পারে না। এই অমোঘ শক্তিধরদের যে পরিচয় বৃহত্তর সমাজের কাছ থেকে সে পায়, রহুকে তার সমগোত্রীয় ভাবতে তার শুধু ভয় নয়, অনিচ্ছাও বটে। কাজেই তার বোধের মধ্যেও রহু বেঁচে থাকে এক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দলপতির মতো। তার উপরে সে দেবত্ব আরোপ করতে পারে না, কারণ দেবত্ব আরোপ করতে পারার সামাজিক স্থিতি তার নেই। সে সমাজচ্যুত। সে ভ্রাম্যমাণও। পথই তার যাবতীয় নীতিনির্ধারক।"[২৭]

বাজিকরের কোন জাত নেই; তারা না সনাতনী, না মুসলিম, না বৌদ্ধ, না খ্রিস্টান, না জৈন। তাদের একটাই পরিচয়- তারা বাজিকর, রহুর অনুসারী, যে রহুর ইচ্ছে, বাজিকরেরা গৃহস্ত হোক, অবসান হোক তাদের যাযাবরী জীবনের। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ভুক্ত নয় তারা, নয় দেবী দুর্গার আশির্বাদধন্য। তারা বৈদিক মন্ত্রপুত নয়, উপনিষদীয় মোক্ষ লাভের উপায় জানে নাই তারা। মশিহ যিশুর কৃপা নেই তাদের সঙ্গে, নেই গৌতম বুদ্ধের চতুরার্য সত্যের নির্যাস এবং অষ্টমার্গীয় বিধান। অভিশপ্ত বাজিকরদের জীবন চলে পথের নিয়মে, রহুর নির্দেশিত পথে।

বাজিকরদের নেই কোন সামাজিক বিবর্তন। তাই তারা বারবার ছিটকে পড়ে মানুষের সমাজ থেকে, বারবার হারতে থাকে থিতু হওয়ার সংগ্রামে, দাঙ্গায় হারাতে থাকে আপনজনদের। অবশ্য লেখক আভাস দিয়েছেন অন্য কিছুর, বলতে চেয়েছেন, বারবার এই হেরে যাওয়া এবং হারানো, মার খাওয়া এবং পুনরায় লড়াই করা বাজিকরদের ভবিষ্যতে থিতু হওয়ার একটা ভিত তৈরি করে দেয়, এক ভবিষ্যৎ শক্তিশালী বংশপরম্পরা তৈরি হয় বাজিকর সমাজে যারা নিশ্চয় ভবিষ্যতে গড়ে তুলবে আরও শক্তিশালী জীবনের ভিত, থিতু হবে এমন এক শক্তি নিয়ে যার ফলে আর কেউ তাদেরকে বিতাড়িত করতে পারবে না, অত্যাচার করতে পারবে না, শোষণ করতে পারবে না; যে রাত শেষ হয়ে কখনও সূর্যোদয় হয় না, যে রাতের অন্ধকার শুধু লবনাক্ত জলে ভাসিয়ে দিতে হয়, সেই রাত পার করে নতুন সূর্যোদয়ের আলোয় আলোকিত হবে তাদের জীবন, খুঁজে পাবে এক নিশ্চিত ঠাই :

> সমাজের মূল ধারার মানুষের মতোই থিতু হওয়ার বাসনা এদের প্রবল, অথচ গোরখপুরের ভূমিকম্পে উৎখাত হওয়ার অনেক আগেই অস্পষ্ট অতীতকালেও কিন্তু এরা ছিলো কোন মরু এলাকার মানুষ, সেখানেও তো যাযাবর হয়েই জীবনযাপন করেছে। এই এতো দীর্ঘকালের পদযাত্রার লক্ষ্য স্থায়ী ঠিকানা। তারা চেয়েছে গৃহস্থ হতে; মেষ থাকবে, লাঙল থাকবে, আর থাকবে জমি। পথে পথে দেবদেবী জোগাড় করলেও কিন্তু তা স্থায়ী হয় না। সম্মানিত ও দাপটের দেবদেবীর কাছে আত্মসমর্পণ করেও এরা অচ্ছ্যুতই রয়ে যায়। এদের একটি অংশ কলেমা পড়ে ঠাঁই মাগে আল্লারসুলের দরবারে। আখারাতে রহমানুর রহিম তাদের জন্য কী বরাদ্দ করেছে অতো দূর ভাববার শক্তি তাদের নেই। তাই নিয়ে মাথাও ঘামায় না। কিন্তু কলেমা পড়লেও ভদ্দরলোক মুসলমানদের সঙ্গে তাদের ব্যবধান আগের মতোই রয়ে যায়। বৃহত্তর সমাজে মিশে যাওয়ার এই প্রচণ্ড ইচ্ছা থেকেই একদিন না একদিন তারা মূলধারায় বিলীন হবে, এ জন্য দাম দিতে হয় খুব চড়া। নিজেদের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয়, কিন্তু মর্যাদা পায় না।[২৮]

ধ্বংসের ভেতর থেকে আবার উঠে দাঁড়ায় বাউদিয়া বাজিকররা, ফিনিক্স পাখির মতো পুনর্জন্ম হয় তাদের, "শত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে বাজিকর নিজের পথ অতিক্রম করে। কিন্তু কখনো থেমে যায় না।"[২৯] ঘর্ঘরা নদীর উত্তর থেকে ঠাই উঠিয়ে আবার যাত্রা শুরু করে পূবের দিকে, ঘুরতে ঘুরতে এসে ঠাই হয় রাজমহলের গঙ্গার ধারে, সেখানে বাজিকরের ছাউনি পড়ে সারি সারি। গোরখপুরের ঠিকানা থেকে রাজমহল- এ যেন ধীরে ধীরে জীবনের শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অপরিচিত দেশের দিকে যাত্রা। রাজমহল, বারহেট, তিনপাহাড়, সাহেবগঞ্জের হাটে বাজারে পীতেমের নেতৃত্বে বাজিকরের দল "রঙিন কামিজ আর ঘাঘরা উড়িয়ে নতুন বিহব্বলতা আনে।"[৩০] বাহারী জিনিস বিক্রি করে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করে তারা। পীতেম বাজার বোঝে ভালো; রূপা, তামা, পিতল, রাঙ ইত্যাদি লাভজনক সওদা আনতে পরতাপ ও জিল্লুকে পাঠিয়ে দেয় মুরশিদাবাদে। এসব মনোহারী দ্রব্যাদি বিনিময় করে সংগ্রহ করে খাদ্যসশ্য। বাজিকরদের দিন চলছিল বেশ কিন্তু সেখানে আঘাত হানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। রাজমহলে গঙ্গার ধারে বাজিকরদের তাবুর ছাউনি বেশীদিন স্থায়ী হতে পারেনি, হঠাৎ টুকরো মেঘের আবির্ভাবে ওঠে ঝঞ্ঝা, তাঁবুগুলোকে ছিড়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়। বাজিকরদের আর সম্ভব হয় না গঙ্গার ধারে থাকা, থানার দারোগার অনুমতি নিয়ে দলপতি পীতেম তাঁবু ফেলে শহর সংলগ্ন মাঠে। অনাগত উজ্জ্বল সময়ের স্বপ্নে বিভোর থাকে পীতেম ও তার বাউদিয়ার দল।

রাজশাহীতে স্থায়ী হতে পারল না বাজিকররা। সেখান থেকে ঠাই গুটিয়ে আবার যাত্রা শুরু করে আরও পূবের দিকে, যেতে যেতে শেষমেশ এসে পৌছায় সেই পূবের দেশে, বাজিকর গোষ্ঠীকে নিয়ে জামির ঠাই গাড়ে পাঁচবিবিতে। এখানেই তারা স্থির

সিদ্ধান্তে আসে, আর 'ভিখ মাঙ্গা' নয়, বান্দর-ভাল্লুক নাচানো নয়, রহু চণ্ডালের হাড়ে ভেল্কিবাজি দেখানো নয়, এবার তারা দলপতি বৃদ্ধ জামিরের নেতৃত্বে পাঁচবিবিতে শক্ত করে খুঁটো গেড়ে বসে থাকবে। আবার নতুন করে জীবন শুরু করার তাগিদ, ঘরবাড়ি বানানোর কাজ, জীবিকার্জনের কাজ শুরু হয় বাদিয়া বাজিকর গোষ্ঠীর। জীবন তো আর থেমে থাকবে না, সে চলমান এক প্রপঞ্চ। চলিষ্ণুতাই জীবনের ধর্ম।

পাঁচবিবিতে আবার শুরু হয়া বাজিকরদের নতুন সংগ্রাম, স্থানীয় জমিদার লালমিয়া আর মহিমবাবুর জঙ্গল ও বাঁশবন পরিষ্কার করে সেই জমিতে শিক্ষানবিশি করে ফসল ফলানো শুরু করে। এভাবে তারা চাষের কাজ পুরোপুরি শিখে নেয়। নতুন তৈরি করা জমিতে যা ফসল ফলে তার অর্ধেক মালিককে দিয়ে বাকি অর্ধেক নিজেরা নেয়। ফসল ফলানোর আনন্দে বাজিকররা উদ্বেল, "নতুন জীবনের স্বাদ, সবরকম রঙের উজ্জ্বলতা তারা খুব ভয়ে ভয়ে অধিকার হিসেবে গ্রহণ করতে শিখল। যাবতীয় অনাস্বাদিত সুখের খোলা দরজার সামনে তারা যেন এসে দাঁড়িয়েছে। এইবারে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি মিলে গেছে। গৃহস্থের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, সামাজিকতার অধিকার যেন আয়ত্বের মধ্যে এসে গেছে। যাযাবরের তাঁবু ছিঁড়ে ফেলে শক্ত খুঁটোর ঘর বাঁধা। তারপর জীবন বয়ে যাবে স্বাভাবিক স্রোতের মতো। অনির্দিষ্টের মধ্যে আর ঘুরতে হবে না। জমি হচ্ছে স্থিতি-দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক।"[৩১] পাঁচবিবিতে বসতি গাড়ার পর বাজিকরদের ঘর হয়, কমবেশি গৃহস্থালি হয় কিন্তু তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। তাবুর ছাউনির পরিবর্তে বাজিকররা এখন স্থায়ী ঘর তৈরি করে বসবাস করে। তবে সে সব ঘরের অবস্থা ভীষণ জীর্ণ, ভঙ্গুর, সরকারী ফরেস্ট থেকে চুরি করে আনা শনের চালা দেওয়া নিচু দাওয়াযুক্ত তালপাতার বেড়া দেওয়া গুহার মতো ঘর, সন্ধার পর সেখানে জমে থাকে স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘন তরলতা। এই জীর্ণ ঘরে বাজিকরদের জীবন কাটে অভাব-অনটনে, অনিশ্চয়তায়।

এই নতুন জায়গায় বাজিকরদের ধর্মমুক্ত অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রবল ধাক্কা খায়, পাঁচবিবির মুসলিম জমিদার লালমিয়া এবং হিন্দু জমিদার মহিমবাবুর কাছে বাজিকরদের ধর্মীয় পরিচয় বড় হয়ে ওঠে। এমন সাম্প্রদায়িক কথা বাজিকরেরা দেড়শো বছরের জীবনে কখনও শোনেনি, তাদেরকে কেউ কখনও প্রশ্ন করেনি তারা মুসলিম না খ্রিস্টান না হিন্দু না বৌদ্ধ না জৈন। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে লুবিনি যেমন জেনেছে তেমনি শারিবাও জানবে, "বাজিকরের নিজস্ব সমাজ বলতে বিশেষ কিছু নেই, বিশ্বাস নেই, ধর্ম নেই, কার্যকারণ, স্থান-কাল-পাত্র কাণ্ডজ্ঞান খুব কম। ... মানুষের সমাজের প্রয়োজনীয় মৌলিক কাজ সে জানে না। সে আসলে ভিরু ও লোভী। তার নিয়তি দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও ক্ষয়রোগ। এই সমস্ত পৃথিবী তার, কিন্তু এমন কোন জায়গা তার নেই যেখানে সে পা রেখে দু'দণ্ড দাঁড়াতে পারে।"[৩২]

মানুষ এক সময় ধর্মহীন ছিল, তখন জীবন ছিল গোষ্ঠীভিত্তিক, গোষ্ঠীর বিধানে চলত জীবন। প্রকৃতির সান্নিধ্যে জীবন কাটিয়ে দেওয়া মানুষগুলোর জটিলতামুক্ত জীবনে ধর্মের কোন ভূমিকা ছিলো না। এতদিন আদিম মানুষের মতোই ধর্মহীন জীবনযাপন করে এসেছে 'রহু চণ্ডালের হাড়'-এর যাযাবর বাজিকররা। যে বাজিকর কখনও হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদের কথা শোনেনি, জাতপাতের কথা শোনেনি, সেই জাতপাত এবং সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের কথাই আজ বড় হয়ে উঠেছে তাদের সামনে। ভারতবর্ষের এক ক্রান্তিকালে লালমিয়া এবং মহিমবাবুর সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন হতভম্ভ করে দিয়েছে বাজিকরদের : "চৌধুরী সাহেব ঐ কথাটি তুলেছে, তুরা হিদুঁ না মোছলমান, অ্যা? মহিমবাবু প্রশ্ন তুলেছে, হাঁই বাপু, তোরা গরুও খাস, শুয়ারও খাস, ই কেমকা জাত রে বাবা?"[৩৩] বাজিকরদের জীবনে আরেকটা ভাঙ্গন অনিবার্য হয়ে ওঠে যখন এই জাতপাতের প্রশ্ন তোলে লালমিয়া এবং মহিমবাবু।

ধর্মের ব্যাপারে বাজিকররা লা-জবাব, তারা জানেই না তাদের ধর্ম কী, ধর্মের কোন প্রয়োজন তাদের জীবনে আদৌ আছে কি নেই সেটাও তারা জানে না। তাই মহিমবাবু বাজিকরের ধর্ম সম্পর্কে জানতে চাইলে আদিম মানুষের মতো তারা অকৃত্রিম সরল দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে প্রশ্নকর্তার দিকে, কী বলবে বুঝে উঠতে পারে না। গোরখপুরে ধর্মমুক্ত জীবন ভালই চলছিল। রাজমহল, মালদহ, রাজশাহী, আমুনাড়া কোথাও বাকিজররা ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্নের মুখে পড়েনি কিন্তু পাঁচবিবিতে ধর্মের প্রশ্ন সামনে চলে আসে। বেশ কয়েক বছর লালমিয়া এবং মহিমবাবুর সেবা করেছে বাজিকররা; তারা তাদের পতিত জমি খালাস করে চাষযোগ্য করেছে কিন্তু লালমিয়া এবং মহিমবাবুর কাছে এখন ধর্মের পরিচয় বড় হয়ে দেখা দেয়। বিগত দীর্ঘ দেড়শ বছর ধরে বাজিকররা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেরিয়েছে কিন্তু ধর্মের এই প্রশ্ন কারোর উঠানোর প্রয়োজন হয়নি, প্রয়োজন হয়েছে লালমিয়া এবং মহিমবাবুর। বাজিকরদের ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন উঠার কারণ

ছিল, "তখন সাহেবরা যাব যাব করছে। হিন্দুস্তান-পাকিস্তান হব হব করছে।"[৩৪] ধর্মের জটিলতামুক্ত বাজিকরদের জীবন জটিল হতে থাকে তখন থেকে যখন লালমিয়া এবং মহিমবাবু ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। বাজিকরদের কোন ধর্ম নেই- এ কথা শুনে লালমিয়া বিস্ময় প্রকাশ করে :

> তোর নাম ইয়াসিন, আর তুমু মুছলমান লও?
> জি মালিক, হামি বাজিকর।
> জুম্মা জিয়াপৎ করো না?
> ওলা জানি না, হুজুর।
> ধম্মোকম্মো কি কর? ঠাকুর দেবতা কিছু আছে?
> ওলামাই, কালীমাই, বিগামাই, এলা সব আছে।
> পূজা আচ্চা হয়?
> থানে সিঁদুর, ধুপ দেবা হয় হুজুর। আর গান হয়।[৩৫]

কিন্তু দৃশ্যপট পাল্টে যেতে থাকে পাঁচবিবিতে যাওয়ার পর। সময়টা বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশক, রাজনৈতিক সঙ্কট ঘনীভূত হতে হতে তুঙ্গে উঠেছে, ভারত-পাকিসতান রাষ্ট্র সৃষ্টি, ধর্মীয় বিভাজন, প্রদায়িকতা ইত্যাদি নিয়ে চারদিকে হলুস্থুলুস কাণ্ড চলছে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট দ্রুত পাল্টাচ্ছিল, ইংরেজরা পাত্তাড়ি গুটাতে শুরু করেছে, ১৯৩৯ সালে জিন্নাহ দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রকাশ করে ভারতবর্ষের অসাম্প্রদায়িক চেতনার মূলে কুঠারাঘাত করে হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদকে প্রকট করে তুলেছেন। তিনি জানিয়ে দিলেন, ভারতবর্ষে দুটি জাতি আছে- একটি হিন্দু অন্যটি মুসলিম, হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্তান আর মুসলিমদের জন্য পাকিস্তান। আর যায় কোথায়, তথাকথিত ধার্মিক উন্মাদরা লুফে নিল জিন্নাহর সাম্প্রদায়িক তত্ত্বকে, ঝাঁপিয়ে পড়ল একে অন্যের উপর, হিন্দুরা মুসলিমদের ঘরবাড়ি জালিয়ে দিল, খুন করল মুসলিমদের; অনুরূপভাবে হিন্দুরা মেতে উঠল ধ্বংসযজ্ঞে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিল মুসলিমদের বাড়িঘর, খুন করল মুসলিমদের। সমগ্র ভারতবর্ষ তখন ধর্মীয় উন্মাদনায় উন্মত্ত, দাঙ্গা হচ্ছে কলকাতায়, নোয়াখালীতে, ঢাকাতে; মানুষ মরছ দেদারছে, হিন্দু-মুসলিম উভয়ই, রাস্তা-ঘাটে, নর্দমায়, হাটে-বাজারে। পাঞ্জাব এবং বাংলা ভাগ হওয়ার দারপ্রান্তে, ধর্মের জিকির তুলে হিন্দুস্তান-পাকিস্তান হওয়ার উন্মাদনা চলছে। এমন ধর্মীয় উন্মাদনার প্রেক্ষাপটেই বাজিকরদের ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে মহিমবাবু এবং লালমিয়া।

লালমিয়া-মহিমবাবুর প্রশ্ন জটিল ঠেকে বাজিকরদের কাছে, কোন উত্তর খুঁজে পায় না তারা। তারা শুধু জানে, তাদের কোন ধর্ম নেই, তারা বাজিকর, তাদের আছে পথ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া কালীমাই, ওলামাই, বিগামাই নামক কতিপয় দেবী। সেসব পথের দেবী সম্পর্কেও তাদের কিছু জানা নেই, "ধর্ম তাদের রেহাই দিয়েছে, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেনি। তারা ধার্মিক নয়, আবার এই কারণেই বকধার্মিক হওয়াও তাদের সাধ্যের বাইরে। এতে বাজিকর যে আরামে দিন কাটায় তা নয়, তাঁর কাছে আল্লা ভগবান নামে এমন কোন পাত্র নেই যার ভেতর তাঁর বিবেচনা, অভিজ্ঞতা সব ঢেলে দিয়ে সে নিশ্চিত হতে পারে।"[৩৬] বাজিকররা শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করে যে, যার ধর্ম নেই তাঁর পায়ের তলায় শক্ত মাটি নেই, ন্যায়নীতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। যার জমি নেই তার স্থায়ী আবাস নেই, ঘর নেই, থিতু হওয়ার সুযোগ নেই; যার সমাজ নেই তার সঙ্গে কোন সামাজিক চুক্তি হয় না। ধর্মের প্রশ্নে ভাঙ্গন ধরে ভারতবর্ষের অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যে, বাজিকর গোষ্ঠীও বাদ যায় না এই ভাঙ্গন থেকে।

বাজিকরদের চেতনায় ধর্মের স্থান নেই, স্বর্গ-নরক-গ্রন্থ-কিতাব সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই, নির্ভার জীবনে এসব প্রশ্ন কখনো তাদেরকে নাড়া দেয়নি, ধর্মমুক্ত এই বাজিকররা পরকালের ভয়ে ধর্মযুক্ত মানুষের মতো ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে না। ধর্মীয় বিধি-নিষেধ তাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখেনি, তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে শুধু অনিশ্চয়তা, স্থিত জীবনের তাগিদ, থিতু গৃহস্থ হওয়ার বাসনা। লালমিয়া ধর্মের বিষ ঢুকিয়েছে বাজিকরের অন্তরে তবে বাজিকর ধর্মকে অন্তরে গ্রহণ করেছে বলেও মনে হয় না কারণ তারা আল্লাহর ভয়ে কিংবা ভেতরের তাগিদে, স্বর্গপ্রাপ্তির লোভে কিংবা নরকের ভয়ে ভীত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি, তারা ধর্ম গ্রহণ করেছে জাত পাওয়ার জন্য, সমাজের মূল ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থিতু হওয়ার জন্য, মর্যাদা পাওয়ার আশায়, যাযাবর জীবনের অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পেয়ে স্থায়ী ঠাই পাওয়ার জন্য। পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে তারা ক্লান্ত, তারা দেখছে তাদের অস্তিত্ব সংকটের মুখে, বিপন্ন; রোগ-ব্যাধিতে তাদের অনেক সদস্য বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে, পাঁচবিবি থেকে তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে অনেকে মারা গেছে, রূপার ছোট ছেলেটা সাপের কামড়ে মারা গেছে,

পলবি লুট হয়ে ধর্ষিতা হয়েছে, সোজন পাখিকে বিয়ে করেও তাকে ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছে তার সমাজের কাছে, মালতীকে বিয়ে করার অপরাধে ওমরকে প্রাণ দিতে হয়েছে অঘোরে, রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি না থাকায় সমাজের অন্যান্য মানুষের মতো তারা পায়নি কোন রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা। অথচ গৃহস্থ মানুষের জীবনে নেই কোন আত্মপরিচয় কিংবা অস্তিত্বের সঙ্কট।

ধর্মীয় অভিঘাতে বাজিকরদের জীবনধর্মের নাশ হয়। ধর্মের প্রলোভন আসে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তির নিকট থেকে। আসলে বাজিকররা জানেই না ধর্ম নামক মানুষে মানুষে বিভাজন সৃষ্টিকারী এক রহস্যময় ফাঁপা শূন্য বস্তুর কোন প্রয়োজনীয়তা তাদের জীবনে আছে। পথে পথে যে দেব-দেবীকে যখন যেখান থেকে পেয়েছে তাদেরকেই বাজিকররা তাদের জীবনের কল্যাণকর শক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। তৌরাত-বাইবেল-কুরান-পুরাণ-বেদ-উপনিষদ-ত্রিপিটক-আগাম-চতুর্যাম নামক ধর্মশাস্ত্র এই পৃথিবীতে আছে তাও তাদের অজানা। পথের দেবতাই তাদের জীবনদেবতা। তাই যখন মোহর গ্রামের কিসমত অংশের মুসলমান পাড়ার সমাজপ্রধান হাজী খেসের শারিবাকে ইসলামের জাতপাতহীন ধর্মীয় ব্যবস্থার কথা পাড়ে, তাকে ইসলামের মাহাত্ম্য তুলে ধরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পরামর্শ দেয় "ইসলামে জাতপাতের বালাই নেই। কাজেই বাজিকর মুসলমান হলে ধর্ম পাবে, সমাজ পাবে, স্বজন পাবে। পড়ে পড়ে মার খাওয়ার কিবা অর্থ হয়। তুমার বাপকে বল, ইয়াসিন সর্দারকে বল, সব বুঝ করি রাজি হওতো মৌলভি বুলা করাই, কলমা পড়ার ব্যবস্থা করি"[৩৭], তখন শারিবা ওমর এবং মালতীকে মুসলমান বানানোর কথা পাড়ে, হাজি সাহেবকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়, ধর্মবিমুক্ততাই বাজিকরদের ধর্ম। কিন্তু পরক্ষণেই জানা যাচ্ছে, বাজিকর সমাজে কারও কারও মধ্যে প্রবেশ করেছে শাস্ত্রীয় ধর্মের প্রভাব। শারিবাকে হাজী খেসের আলী ইসলাম ধর্ম গ্রহণের যে প্রস্তাব দিয়েছিল, শারিবা সেই প্রস্তাব উত্থাপন করে রূপার বাড়ীতে জমায়েতের কাছে : হিন্দু সমাজ তাদেরকে গ্রহণ না করলেও কলমা পড়ে মুসলমান হলে মুসলমান সমাজ তাদেরকে গ্রহণ করবে। এমন কি দলপতি ইয়াসিন পর্যন্ত শারিবার প্রস্তাবে সায় দেয়। ইয়াসিন শারিবার মতো সামাজিক নিরাপত্তা চায়, তার যুক্তি অকাট্য, 'শালো বাজিকর, শালো বেজাত' ইত্যাদি অবমাননাকর গালি শোনার দায় থেকে নিষ্কৃতি পাবে, বাজিকরদের যুবতী মেয়েগুলো বিয়ের ঘর পাবে, বাজিকররা পাবে সমাজ। তার পর্যবেক্ষণ ও বিবেচনায় মুসলিম সমাজে ঝামেলা কম, জাত-পাতের বিচার কম, উচুনিচুর ভেদাভেদ নেই বললেই চলে। প্রস্তাব শুনে ক্ষিপ্ত হয় রূপা, সে ফুঁসে ওঠে। অজ্ঞাতবাস জীবনে হিন্দু ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে রূপার জীবনে, তার ঘরে বিষহরির ঘট আছে, সে হিন্দুসঙ্গ করেছে, জয় মা মনসা ধ্বনি করে, হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করে সংসার করছে, "তার সংস্কারের মধ্যে হিন্দুত্ব ঢুকে গেছে। সে বিষহরির গান গায়, ঘটপূজা করে, রাজবংশীদের কালিপূজা এবং গম্ভীরার উৎসবে যোগদান করে।"[৩৮] হিন্দু ঘরের মেয়ে শরমীকে বিয়ে করার ফলে হিন্দু সংস্কার রূপার মধ্যে শেকড় গেড়েছে গভীরভাবে। শরমীর হাতের শাখা রূপার চোখে নতুন অভিজ্ঞতার পবিত্রতা নিয়ে এসেছে। তাই তার পক্ষে মুসলমান হওয়া সম্ভব নয় তবে ধর্মের বিরোধ সম্পর্কে রূপা জ্ঞাত; সে জানে, ধর্ম সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করে। এটাও সে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারে, বাজিকর সমাজে ধর্মের এই বিভাজন রোধ করার কোন পথ খোলা নেই। যেখানে বাজিকরদের অস্তিত্ব বিপন্ন, সেখানে ধর্মের বিভাজনের বলি হওয়া ছাড়া আর উপায়ই বা কি। তাই অমত থাকা সত্তেও রূপা মত দেয় : "সর্দার রূপায় (উপায়) যখুন আর কেছু নাই, বাঁধা হামি দিমো না। তবি হামাক্ জোরাজোরি করেন না। হামার ঘরণী হিঁদু। হামার ঘর বাদ দেন, শারিবাক্ বাদ দেন।"[৩৯] এই যে দুই দল দুই ধর্মের দিকে যাচ্ছে, এই যাওয়াই তাদের পথকে আলাদা করে দিবে। যে বাজিকর গোষ্ঠীতে ছিল না কোন ধর্ম, ধর্মের বিভাজন, সেই বাজিকর গোষ্ঠীতে এভাবেই ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ ঘটে ধর্মের; ফলে বাজিকর সমাজের কাঠামো ধীরে ধীরে ভাঙ্গতে থাকে, ভাঙ্গনের মুখে ছিন্নভিন্ন হয় বাজিকর গোষ্ঠী।

ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের বিচার কখনও করেনি বাজিকররা, এমন কি ধর্ম নামক একটা বিষয় যে জগতে আছে তাও কখনও তাদের মনে আসেনি। কিন্তু আজ ভারত ভাগের সংকটময় মুহূর্তে সেই ধর্মই হয়ে ওঠে বাজিকরদের আশ্রয়, থিতু হওয়ার রক্ষাকবচ। ধর্মমুক্ত বাজিকর ধর্মগ্রহণ করতে চায় স্থিতির আশায়। তারা উপলব্ধি করতে পারে যে, ধর্মের বাইরে থেকে লড়াই করে জমি স্থিতি কোনটাই পাওয়া সম্ভব নয়। তাই ধর্মের ভেতরে ঢুকতে হবে, ধর্মের অনুসারীদের সারিতে দাঁড়াতে হবে কারণ পৃথিবীতে ধর্ম এমন এক আবেগ যাকে পাশ কাটিয়ে সামাজিক পরিমণ্ডলে প্রবেশ করা সম্ভব নয়, বাইরে থেকে শুধু সমাজের ভেতরে প্রবেশ করার জন্য হাপিত্যেশই সার। তাই বাজিকরদের ধর্মগ্রহণ অনিবার্য হয়ে পড়ে। হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি খুব কম সংখ্যক বাজিকর আগ্রহ দেখায় কারণ তাদের অভিজ্ঞতায় তারা দেখেছে হিন্দু ধর্ম হাজারো সংস্কারে জর্জরিত, সেখানে আছে নানান দল-উপদল। তুলনায় ইসলাম ধর্ম অনেকটাই সংস্কারমুক্ত, মুসলমান সমাজে জটিলতাও কম। তাই মুসলমান হলে

> পথের অভিশাপ থেকে এবার মুক্তি মিলবে, আর কেউ অন্তত বেজাত বলতে সাহস করবে না। ঠাঁই মিলবে, কাজ মিলবে, দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে, একটা স্থিতি, যে স্থিতির জন্য বংশপরম্পরায় রক্তের উষ্ণতার যুগ যুগ শুধু মাসুল দিয়েই এসেছে, তার যোগ্যতর সমাধান হবে, উপরন্তু রহুর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হবে। শত শত বছর ধরে যে জাতি শুধু তাড়িত হয়েছে, পীড়ন যাদের অলঙ্ঘ্যের মতো, খুন ও ধর্ষণ যাদের জীবনে ধ্রুবের মতো, এই রকম ছিন্ন ভিন্ন অবজ্ঞেয়, অপাঙক্তেয়, ধিকৃত, মানবেতর জীবনযাপনকারী অর্ধবর্বর কোন শিকড়হীন সম্প্রদায়কে বৃহত্তম ধর্মীয় গোষ্ঠী সমমর্যাদায় যদি আপন করে নেয় তাহলে তা স্বর্গপ্রাপ্তির দশা ..."[৪০]

ইয়াসিন বাজিকর ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার লোকজন সবাইকে নিয়ে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে, জাতে উঠবে, সামাজিক নিরাপত্তা পাবে। হাজী খেসেরের সঙ্গে তেমনটাই সাব্যস্ত হয়েছে। কথাটা ইয়াসিন যখন রূপাকে বলে, তখন রূপা স্পষ্ট দেখতে পায়, বাজিকর সমাজ হিন্দু-মুসলিম দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। ধর্ম গ্রহণই এখন তাদেরকে যাযাবর জীবন থেকে, তাড়া খাওয়া জীবন থেকে মুক্তি দিতে পারে : "ষলই কার্তিক মহরমের দিনেৎ হামরা কলমা পড়ব, মোছলমান হব। তা-বাদে একসাথ নামাজ পড়া হবে, একসাথ খানাপিনা হবে। হাজীসাহেব হামাদের সাথ পাত পাড়বে, আর আর মোছলমান ইমানদার মানুষ হামরাদের সাথ পাত পাড়বে। হামরা উঁচু হব, হামরাদের জাত হবে।"[৪১] রূপা এসব কথা বিশ্বাস করে না, সে সন্দিহান। বহুকাল থেকে সে দেখে এসেছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এটে থাকা ধর্মের চরিত্র, ধর্মমানা মানুষের চরিত্র। যারা মোসলমানের সঙ্গে থাকতে থাকতে মোসলমান হয়েছে, মুসলিম সমাজ তাদেরকে গ্রহণ করেনি, তাদের সমাজে বাজিকরদের ঠায় হয়নি। রূপা এও বুঝেছে, "হামি হিঁদু হলাম, তুমু মোছলমান হলেন। হিঁদু হামাক্ জাতে লেয় না, মোছলমান তুমায় জাতে লিবে, সে বিশ্বাস হামার নাই। বহুৎ দেশ দেখা আছে মোর। তবু রূপায় যখুন নাই, যান তুমরা, হন মোছলমান। এখন তো বাঁচেন, দলকে বাঁচান। ... কে বা জানে, হয়তো একদিন তুমার বেটা হামার মাথাৎ ডাং মারবে, 'শালো হিঁদু' বলে, আর হামার বেটা তুমার বুকেৎ ফাল্লা বিধাবে 'শালো মোছলমান' বলে।"[৪২] বড় নির্মম সত্য কথা বলেছে রূপা। বাজিকর সমাজে যে আত্মীয়তার বন্ধন আজ আছে, যে ভ্রাতৃত্ববোধ আছে তা একদিন শত্রুতায় পরিণত হবে এই ধর্মীয় বিভাজনের কারণে। বাজিকরদের ধর্মহীন জীবনে যে সহমর্মিতা ছিল ভবিষ্যতে তা ভেঙ্গে পড়বে, বাজিকর সমাজের সেই বিরহমিলনপূর্ণ জীবন নিঃশেষ হয়ে যাবে। রূপা এবং ইয়াসিনের উপলব্ধিতে ভবিষ্যতের এই বাজিকর সমাজ জন্ম দেয় বিষাদের, তাদের মনে হয় দুইজনের পথ ভিন্ন হয়ে গেছে, "যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্ত দিয়ে দুই যাযাবর গোধূলিতে নিজেদের তাবুতে ফিরছে। আর কোনোদিন সেই তাঁবু থেকে তারা সূর্যোদয় দেখতে বেরোবে না।"[৪৩] লেখকের বর্ণনায় মাঠের ওপারে অস্তগামী গভীর রক্তাক্ত যাযাবরী সূর্য বাজিকর সমাজের ভেঙ্গে পড়ার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। ধুসর ভবিষ্যৎ উকি মারে ইয়াসিন এবং রূপার দিকে, পথের মানুষ যাযাবর, পথ তাদেরকে অভিশাপ দিবে; প্রান্তরের মানুষ যাযাবর, প্রান্তরের ঝোড়ো হাওয়া তাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, নিক্ষেপ করবে গভীর অন্ধকার খাদে।

শেষ পর্যন্ত আত্মপরিচয়, স্থিতি ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বাজিকরদের বেশিরভাগই মহরমের দিন কলেমা পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এদিন মালদহ শহর ও গ্রামাঞ্চল থেকে গণ্যমান্য মুসলমানরা ধর্মগ্রহণানুষ্ঠানে উপস্থিত হয় হাজী সাহেবের অতিথি হয়ে। ধর্মগ্রহণের মধ্য দিয়ে হাজার বছরের বাজিকর ঐতিহ্যে ভাঙ্গন ধরে। নতুন যুগের সূত্রপাত ঘটে সাম্প্রদায়িক ভাবনার বিকাশের মধ্য দিয়ে। বাজিকরদের একটাই পরিচয় ছিল আগে, তারা বাজিকর, তাদের কোন জাত নেই, ধর্ম নেই। ভাঙ্গনের এই ধারায় সংখ্যাগরিষ্ঠ বাজিকররা এখন জাতিতে মুসলিম এবং তাদের ধর্ম ইসলাম। একটা লক্ষণীয় বিষয় হলো, বাজিকরদের নামগুলোর মধ্যে কিছু আছে মুসলিম নাম আবার কিছু নাম আছে হিন্দু ঐতিহ্যে। যে সকল বাজিকরের নাম ইসলামি ঐতিহ্যে ছিল সেগুলোর আদ্য নাম ঠিক থাকলেও বাজিকরের পরিবর্তে মণ্ডল হলো এবং হিন্দুয়ানী নামের ক্ষেত্রে এলো আমূল পরিবর্তন; তারা গ্রহণ করল মুসলিম নাম।

মুসলিম এবং হিন্দুয়ানিতে বিভক্ত বাজিকরেরা ভুলে যায় রহুকে। বাজিকরদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ছেড়ে তারা পরে লুঙ্গি-গেঞ্জি। দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ধর্মমুক্ত বাজিকররা "জাত পায়, ধর্ম পায়, দেশ পায়, আত্মপরিচয় পায়, স্থিতি পায়। রেশন কার্ড, চিনি, কেরোসিন, এইসব সামাজিক বন্দোবস্তগুলোর তারা অংশীদার হয়ে ওঠে। হিন্দু, মুসলমান ভোটের রাজনীতি, আল্লা, বিষহরির প্রতাপে ক্রমে ক্রমে রহু চণ্ডালকে ভুলে যেতে থাকে। বাদিয়া বাজিকররা নিজেদের একমাত্র আত্মপরিচয়টি

হারিয়ে খুঁজে পায় নিজেদের সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রিক পরিচয়। এভাবে তাদের পুরনো আত্মপরিচয়ের বিনির্মাণ ঘটে, এবং আধুনিক রাষ্ট্রের উপযোগী করে ক্ষমতা-ব্যবস্থা তাদের নতুন আত্মপরিচয় গড়ে দেয়।"[৪৪] ধর্ম এবং জাত পেলেও বাজিকরদের স্বতন্ত্র জীবনের আর অস্তিত্ব রইল না, তারা হয়ে উঠলো খণ্ডিত মানবতার অংশ। ধর্মীয় পরিচয় গ্রহণের ফলে বাজিকরদের সুদীর্ঘকালের গোষ্ঠীজীবন ও ঐতিহ্যে ধরল ভাঙ্গন।

বাজিকররা তাদের গোষ্ঠী এবং ব্যক্তির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদে পরিভ্রমণ করছে দীর্ঘ পথ, ধর্মের ছায়ায় গিয়ে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে চায়, বেজাতের তক্‌মা মুছে সমাজের মূল ধারায় প্রবেশ করে থিতু হতে চায়। কিন্তু যতবার চেষ্টা করেছে ততবারই তাদের স্বপ্ন ভেঙ্গে গুড়িয়ে গেছে, উপন্যাসের শেষে ব্রাত্য বেজাত হয়েই মুসলমানদের সঙ্গে একীভূত হয়েছে ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে। তাদের অস্তিত্বের মূলে কুঠারাঘাত করেছে সমাজের তথাকথিত ভদ্রলোকেরা, অস্তিত্ব বিপন্ন না হলেও তাতে ধরেছে বড় রকমের ভাঙ্গন। রহুর দৈহিক অস্তিত্বের বিনাশ ঘটেছে বহিরাগত দখলদারদের আঘাতে, রাজমহলের উত্তরে ঘর্ঘরা নদীর তীরে ভঙ্গুর অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থেকেছে কোনমতে, মালদার জামিলাবাদের নমনকুড়িতে বাজিকরদের অস্তিত্বের শেকড় খানিকটা মৃত্তিকার গভীরে প্রোথিত হলেও তা উপড়ে গেছে, রাজশাহীর পদ্মার তীরে তাদের অস্তিত্বের সঙ্কট আরও প্রকট হয়েছে, বাস উঠিয়ে ছুটতে হয়েছে আরও পূবে পাঁচবিবিতে। দেশভাগ বাজিকরদের অস্তিত্বকে আরেকবার বিপর্যস্ত করেছে, সেখান থেকে তাড়া খেয়ে ছুটতে ছুটতে ঠাই গেড়েছে মোহরে। এভাবে বার বার বাজিকরদের অস্তিত্ব ভাঙ্গনের মুখে পড়েছে। সমাজের মানুষের অত্যাচার সহ্য করেছে "শান্তি রক্ষার স্বার্থে। ... লোকসান মেনে নিয়েছে শুধু অস্তিত্বের প্রয়োজনে।"[৪৫]

ধর্মগ্রহণ যে বাজিকরদের সামাজিক সমস্যার কোন সমাধান দিতে পারবে না, তাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটাবে না, মুসলমান সমাজে বাজিকররা ব্রাত্য, অচ্ছ্যুত, অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ, অনাহুত হয়ে থাকেব এ সত্য প্রথম দিকে বাজিকর বুঝতে না পারলেও বুঝতে পারে হানিফ, "ধর্ম থাকলেই যে বাজিকর থিতু হতে পারবে, সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয় হানিফ। বাজিকরেরা মুসলমান হবে শুনে সে তাই উল্লসিত বোধ করে না।"[৪৬] সে বিশ্বাস করে, বাজিকরদের ইসলাম কিংবা সনাতন ধর্মগ্রহণ বাজিকর গোষ্ঠীতে বিভাজন সৃষ্টি করবে, ধর্মীয় বিভাজনকে প্রকট করে তুলবে, তার চেয়ে ভালো মুসলমান এবং হিন্দু সবাই যদি বাজিকরদের মতো ধর্মমুক্ত বেজাত হয়ে যায় সেটাই সমাজের জন্য মঙ্গলজনক হবে। হানিফের দৃষ্টিভঙ্গি লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিরই বহিঃপ্রকাশ বলে মনে হয়। শারিবার সঙ্গে তার কথোপকথন থেকে ধর্মগ্রহণের ফাঁকিটা প্রকাশ পায় :

> কিন্তু শারিবা, আমি তোমাদের মোছলমান হবার কথাডা ভাবতেছি। এতে কিবা লাভ হবে? কার লাভ হবে? হিঁদুরই বা কী লাভ? মোছলমানেরই বা কী লাভ? আর বাজিকরেরই বা কী লাভ?
>
> মোছল মানের লাভ হাজিসাহেব জানেন। হিঁদুর লাভ জানি না। কেন্তু বাজিকরের লাভ আছে।
>
> আছে?
>
> নাই! বাজিকর যবে থিকা থিতু হওয়ার বাস্‌না করল, তবে থিকাই সে সমাজের মানুষের কাছেৎ আপন হবার চায়। কেউ তাক্ আপন করে না। আজ যদি হাজিসাহেব তাক্ আপন করবা চায় তো সি যাবে না?
>
> তুমি ঠিক জানো, হাজীসাহেব তোমাদের আপন করবা চায়?
>
> মোছলমান তো করবা চায়।
>
> মোছলমান করলে তোমরা থিতু হবার পারবা? ... ধরম থাকিলেই তুমরা থিতু হবার পারবা?
>
> বাজিকরের কাছেৎ হানিফ ভাই, আইজের দিনটা সব থিকা বড় কথা এখুন পর্যন্ত। আইজকার দিনেৎ মোছল মান হওয়া বাঁচব। ইয়ার বেশি কেছু জানা নাই।
>
> বাঁচার রাস্তা ইটাও লয়, শারিবা। আমার সাথ শহর চল, বাঁচার রাস্তা তোমারে দেখায়া দেব।[৪৭]

এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে বাজিকররা পেল বসতি স্থাপনের নতুন জায়গা। লালমিয়া এবং মহিমবাবুর বন-জঙ্গল আর বাঁশের বাগান পরিষ্কার করে সেখানেই পত্তনি পেল জমির। দীর্ঘ দুই বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করার পর ফসল উঠল বাজিকরদের ঘরে। দিনে দিনে চাষের অভিজ্ঞতা অর্জন করে এক সময় পুরোদস্তুর গৃহস্থ চাষী হয়ে উঠলো কতিপয় বাজিকর। জামির বাজিকরের মৃত্যু পর্যন্ত গৃহস্থ চাষী হওয়ার যে সপ্ন তারা দেখেছে, তা আজ বাস্তব, এক নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছে তারা, পেয়েছে

গেরস্ত জীবনের স্বাদ, বাজিকরের পুরনো জীবনের সঙ্গে আজ আর তাদের কোন সম্পর্ক নেই : "জীবনের নতুন স্বাদ, সবরকমের রঙের উজ্জ্বলতা তারা খুব ভয়ে ভয়ে অধিকার হিসেবে গ্রহণ করতে শিখল। যাবতীয় অনাস্বাদিত সুখের খোলা দরজার সামনে তারা যেন এসে দাঁড়িয়েছে। এইবারে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি মিলে গেছে। গৃহস্থের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, সামাজিকতার অধিকার যেন আয়ত্তের মধ্যে এসে গেছে। যাযাবরের তাঁবু ছিঁড়ে ফেলে শক্ত খুঁটোর ঘর বাঁধা। তারপর জীবন বয়ে যাবে স্বাভাবিক স্রোতের মতো। অনির্দিষ্টের মধ্যে আর ঘুরতে হবে না।"[৪৮]

মুসলমান হয়েও বাজিকররা ব্রাত্যই রয়ে গেছে; অন্ত্যজ শ্রেণীর তকমা কিছুতেই ঘুচাতে পারেনি তারা। বাদা-কিসমতের বাজিকর পাড়ায় হিন্দু-মুসলিম পার্থক্য খুব একটা স্পষ্ট না হলেও একেবারে মুছে যায়নি। তবে বাজিকরদের কোন পরিবর্তন হয়নি, তারা একই রকম রয়ে গেছে, যে বাজিকর সেই বাজিকরই থেকে গেছে তারা, "সেই একই নিরন্ন হাঘরে সমাজ বহির্ভূত অসহায় বাজিকর।"[৪৯] বাজিকর থেকে তারা বেজাত মুসলমান হয়েছে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, ইসলামের কিরাকালাম মেনে, হাদিস মেনে ইসলামি বিধানে জীবন যাপন করেও তারা জাতে উঠতে পারেনি। জাতিগত অস্তিত্বের সঙ্কটে দিশেহারা বাজিকর সম্প্রদায় স্বজাতিত্ব ছেড়ে কুলীন সমাজের স্রোতধারায় লীন হতে গিয়ে আসলে তাদের আত্মপরিচয় বিলীন হয়ে গেছে, "শত শত বছর অতিবাহী বাজিকর সম্প্রদায়ের রক্তাক্ত ইতিহাসে আপন অস্তিত্বকে শনাক্তকরণের যে সর্বস্বান্তীয় প্রক্রিয়া চলেছে সেখানে ওদের জন্য আত্মবিনাশ ছাড়া আর কিছুই নেই।"[৫০]

ধর্ম আধ্যাত্মিক মুক্তি দিতে পারলেও বৈষয়িক মুক্তি দিতে পারে না। বাজিকরদের জীবনে পরকাল কিংবা আধ্যাত্মিক মুক্তির চেয়ে বৈষয়িক অস্তিত্বের মূল্য অধিক। তারা আধ্যাত্মিক স্থিতি কিংবা মুক্তি কোনটাই চায় না, তারা চায় তাদের অস্তিত্বের শেকড় প্রোথিত হোক মাটির গভীরে, সমাজের মূল ধারায় গৃহীত হোক তারা। যাযাবর বাজিকরদের সংগ্রাম মর্যাদা নিয়ে সমাজে বেঁচে থাকার সংগ্রাম।

তথ্যসূত্র

১. শোয়েব শারিয়ার : অভিজিৎ সেন : এক মহাকাব্যিক কীর্তনিয়া, রাহেল রাজীব সম্পাদিত রহু চণ্ডালের হাড় প্রাসঙ্গিক পাঠ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৬৯।
২. শোয়েব শারিয়ার : অভিজিৎ সেন : এক মহাকাব্যিক কীর্তনিয়া, রাহেল রাজীব সম্পাদিত রহু চণ্ডালের হাড় প্রাসঙ্গিক পাঠ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৭০।
৩. রাহুল দাশগুপ্ত : রহু চণ্ডালের হাড় ও আখ্যানের তিন স্তর : একটি আলোচনা, রাহেল রাজীব সম্পাদিত রহু চণ্ডালের হাড় প্রাসঙ্গিক পাঠ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৫৭।
৪. শোয়েব শারিয়ার : অভিজিৎ সেন : এক মহাকাব্যিক কীর্তনিয়া, রাহেল রাজীব সম্পাদিত রহু চণ্ডালের হাড় প্রাসঙ্গিক পাঠ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৭০।
৫. তপোধীর ভট্টাচার্য : উপন্যাসের প্রতিবেদন, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ১৬৮।
৬. মাখনচন্দ্র রায় : রহু চণ্ডালের হাড় : উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ, রাহেল রাজীব সম্পাদিত রহু চণ্ডালের হাড় প্রাসঙ্গিক পাঠ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ২০০।
৭. অভিজিৎ সেন : রহু চণ্ডালের হাড় সম্পর্কে দু-একটি কথা যা আমার বলবার আছে, রাহেল রাজীব সম্পাদিত রহু চণ্ডালের হাড় প্রাসঙ্গিক পাঠ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ১৪।
৮. অভিজিৎ সেন : রহু চণ্ডালের হাড় সম্পর্কে দু-একটি কথা যা আমার বলবার আছে, রাহেল রাজীব সম্পাদিত রহু চণ্ডালের হাড় প্রাসঙ্গিক পাঠ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ১৪-১৫।
৯. রূপশ্রী দেবনাথ : ঠাঁই বদলের ইতিহাস : প্রেক্ষিত রহু চণ্ডালের হাড়, *International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS)*, ২০১৪, Vol 1, No. 4, পৃষ্ঠা ৯৭।
১০. তপোধীর ভট্টাচার্য : উপন্যাসের বিনির্মাণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০২০, পৃষ্ঠা ২৩৬।
১১. অভিজিৎ সেন : রহু চণ্ডালের হাড়, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ২৪২-২৪৩।
১২. অভিজিৎ সেন : রহু চণ্ডালের হাড়, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ৯১।
১৩. অভিজিৎ সেন : রহু চণ্ডালের হাড়, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ৯২-৯৩।
১৪. অভিজিৎ সেন : রহু চণ্ডালের হাড়, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ৯৩।

১৫. অভিজিৎ সেন : রহু চণ্ডালের হাড়, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ৯৯।
১৬. অভিজিৎ সেন : রহু চণ্ডালের হাড়, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ১৩৯।
১৭. অভিজিৎ সেন : রহু চণ্ডালের হাড়, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ১১১।
১৮. অভিজিৎ সেন : রহু চণ্ডালের হাড়, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ১৩৯।
১৯. অভিজিৎ সেন : রহু চণ্ডালের হাড়, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ১৪১।
২০. অভিজিৎ সেন : রহু চণ্ডালের হাড়, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ১৪১।
২১. রাহুল দাশগুপ্ত : রহু চণ্ডালের হাড় ও আখ্যানের তিন স্তর : একটি আলোচনা, রাহেল রাজীব সম্পাদিত রহু চণ্ডালের হাড় প্রাসঙ্গিক পাঠ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৪৫-৪৬।
২২. অভিজিৎ সেন : রহু চণ্ডালের হাড়, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ২৪২-২৪৩।
২৩. অভিজিৎ সেন : রহু চণ্ডালের হাড়, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ২৬২।
২৪. শোয়েব শারিয়ার : অভিজিৎ সেন : এক মহাকাব্যিক কীর্তনিয়া, রাহেল রাজীব সম্পাদিত রহু চণ্ডালের হাড় প্রাসঙ্গিক পাঠ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৭৩।
২৫. শোয়েব শাহরিয়ার : অভিজিৎ সেন : এক মহাকাব্যিক কীর্তনিয়া, রাহেল রাজীব সম্পাদিত রহু চণ্ডালের হাড় প্রাসঙ্গিক পাঠ, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৭১।
২৬. অভিজিৎ সেন : রহু চণ্ডালের হাড়, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ৭৬।
২৭. অভিজিৎ সেন : রহু চণ্ডালের হাড়, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ৮৯।
২৮. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : অভিজিৎ সেনের হাড়তরঙ্গ, রাহেল রাজীব সম্পাদিত রহু চণ্ডালের হাড় প্রাসঙ্গিক পাঠ, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ২৪।
২৯. মুসাব্বির হুসাইন : দেবতা না, দলপতি রহু, প্রথম আলো, ২৩ অক্টোবর ২০১৯।
৩০. অভিজিৎ সেন : রহু চণ্ডালের হাড়, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ১৮।
৩১. অভিজিৎ সেন : রহু চণ্ডালের হাড়, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ১৮৬-১৮৭।
৩২. অভিজিৎ সেন : রহু চণ্ডালের হাড়, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ১৮২।
৩৩. অভিজিৎ সেন : রহু চণ্ডালের হাড়, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ১৮৬।
৩৪. অভিজিৎ সেন : রহু চণ্ডালের হাড়, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ১৮৬।
৩৫. অভিজিৎ সেন : রহু চণ্ডালের হাড়, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ১৮৭।
৩৬. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : অভিজিৎ সেনের হাড়তরঙ্গ, রাহেল রাজীব সম্পাদিত রহু চণ্ডালের হাড় প্রাসঙ্গিক পাঠ, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ২২।
৩৭. অভিজিৎ সেন : রহু চণ্ডালের হাড়, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ২১২।
৩৮. অভিজিৎ সেন : রহু চণ্ডালের হাড়, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ২১৪।
৩৯. অভিজিৎ সেন : রহু চণ্ডালের হাড়, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ২৩৭।
৪০. শোয়েব শারিয়ার : অভিজিৎ সেন : এক মহাকাব্যিক কীর্তনিয়া, রাহেল রাজীব সম্পাদিত রহু চণ্ডালের হাড় প্রাসঙ্গিক পাঠ, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৭৬।
৪১. অভিজিৎ সেন : রহু চণ্ডালের হাড়, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ২৩৮।
৪২. অভিজিৎ সেন : রহু চণ্ডালের হাড়, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ২৩৮।
৪৩. অভিজিৎ সেন : রহু চণ্ডালের হাড়, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ২৩৮।
৪৪. রাহুল দাশগুপ্ত : রহু চণ্ডালের হাড় ও আখ্যানের তিন স্তর : একটি আলোচনা, রাহেল রাজীব সম্পাদিত রহু চণ্ডালের হাড় প্রাসঙ্গিক পাঠ, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৪৬।
৪৫. আশুতোষ সরকার, রহু চণ্ডালের হাড় অস্তিত্ব বাস্তবতার অন্তরালে অন্যতর অনুবেদন, রাহেল রাজীব সম্পাদিত রহু চণ্ডালের হাড় প্রাসঙ্গিক পাঠ, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ১৪৮।
৪৬. রাহুল দাশগুপ্ত : রহু চণ্ডালের হাড় ও আখ্যানের তিন স্তর : একটি আলোচনা, রাহেল রাজীব সম্পাদিত রহু চণ্ডালের হাড় প্রাসঙ্গিক পাঠ, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৪৫।
৪৭. অভিজিৎ সেন : রহু চণ্ডালের হাড়, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ২৪২-২৪৩।
৪৮. অভিজিৎ সেন : রহু চণ্ডালের হাড়, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ১৮৬-১৮৭।

৪৯. অভিজিৎ সেন : রহু চণ্ডালের হাড়, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ২৬২।

৫০. শোয়েব শারিয়ার : অভিজিৎ সেন : এক মহাকাব্যিক কীর্তনিয়া, রাহেল রাজীব সম্পাদিত রহু চণ্ডালের হাড় প্রাসঙ্গিক পাঠ, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৭৩।